সঞ্চয়ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ্য সংস্করণ

সঞ্চয়ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচীপত্র

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান !
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন !
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্‌।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর॥

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে—
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবনবনে ?।

কী দেখিছ, বঁধু, মরম-মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ—
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার—
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি !
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি ॥

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ জাগরণ ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন—
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা আজি কি হয়েছে ভোর ?

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীনজীবনডোরে॥

২৯ মাঘ ১৩০২

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?'
দেবতা কহিলা, 'আমি।' শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?'
দেবতা কহিলা, 'আমি।' কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, 'তুমি কোথা প্রভু!'
দেবতা কহিলা, 'হেথা।' শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি;
দেবতা কহিল, 'ফির।' শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!'

১৪ চৈত্র ১৩০২

পরিচয়

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি-'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে॥

২১ চৈত্র ১৩০২

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।

বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
'এসো এসো' সুরে করুণমিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন—
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন—
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা।

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৫ বৈশাখ ১৩০৪

বর্ষামঙ্গল

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে।
দিগ্‌বধূচিত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মদ বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ কিঙ্কিণীকলকলনা,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে॥

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী,
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী॥

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে—
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে, সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা॥

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১৭ বৈশাখ ১৩০৪

ন্যায়দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ!
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে; তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে॥

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম

তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান ॥

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ॥

শিবাজি-উৎসব

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্-এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ—
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ—

শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমলনির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লিসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি ॥

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রলিখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা—
সেদিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা ॥

তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা— মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা ॥

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥

সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধুলায় হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে॥

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।

যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি ॥

হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন ॥

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগী,
গিরিদরীতলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে,
সেইমত বাহিরিলে— বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা ॥

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে,
কী অপূর্ব হেরি,
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরি।
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার॥

মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে॥

আজও তার সেই মন্ত্র— সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে।

অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ—
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ ॥

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য রণ-অশ্বদল
অস্ত্র খরতর—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
'হর হর হর'।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,
করিল আহ্বান—
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামী,
বাঙালির প্রাণ ॥

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন-শতাব্দ-কাল ধরি—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে,
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণী-রূপে আনি দিবে নূতন পরান
নূতন প্রভাত ॥

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদকলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো ঘৃণা করি দূরে আছে
যারা আজও
বন্ধ নাশিবে— তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখবহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

অপমানিত

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের-দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীনপতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

২০ আষাঢ় ১৩১৭

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে, কেমন করে সইব !
বাতাস আলো গেল মরে, একি রে দুর্দৈব !
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে, গান আছে যার ওঠ্‌-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্‌ রে ধেয়ে, আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে, ওই-যে অভয় শঙ্খ ॥

চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য
খুঁজি সারা দিনের পরে কোথায় শান্তিস্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত তোমার মহাশঙ্খ ॥

আরতিদীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথব রক্তজবার মালা ? হায় রজনীগন্ধা !
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি নীরব তব শঙ্খ ॥

যৌবনেরই পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপক তানে উঠুক ধ্বনি দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।

নিশার বক্ষ বিদার ক'রে উদ্‌বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ-বা ছুটে আসবে পাশে কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব— আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥

রামগড়
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

আশা

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা॥

বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা ;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথাভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে

জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর ১৯২৪

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ?
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে ?
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ ?।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার॥

দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, 'মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।'
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি॥

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা—
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে॥

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।

আমি যে দেখেছি— প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?।

পৌষ ১৩৩৮

শুচি

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ—
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব—
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে—
এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে,
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে।
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা—
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি?'
ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে?
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে,
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'
'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'—
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।

ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল ; বললেন—
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা !'
রামানন্দ বললেন, 'প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।'

তখন রাত্রি তিন-প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন।
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে ; শুনতে পেলেন—
'সময় হয়েছে, ওঠো— প্রতিজ্ঞা পালন করো।'
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।'
ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে ?
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।'

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, 'প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি—
অপরাধী করবেন না আমাকে।'
গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন,
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।'

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন—
'প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,

আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি, বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন—
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন।
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে,
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে ;
ধিক্‌কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন, প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে
এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম,
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে,
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

[অগ্রহায়ণ ১৩৩৯]

ইস্‌টেশন

সকাল বিকাল ইস্‌টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি,
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে ;
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে, কেউ বা উজান ট্রেনে।

সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে।—
দিনরাত গড়্-গড়্ ঘড়,-ঘড়্
গাড়ি-ভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে॥

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য-মেলার নিত্য-ভোলার ভাষা—
কেবল যাওয়া-আসা।
মঞ্চতলে দণ্ডে পলে ভিড় জমা হয় কত—
পতাকাটা দেয় দুলিয়ে, কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখ দুঃখ ক্ষতি লাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।
সময়ের ঘড়ি-ধরা অঙ্কেতে
ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে।
দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই—
কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই॥

ওদের চলা ওদের প'ড়ে থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে কেবল ছবি আঁকায়।

খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে তার পরে যায় মুছে,
আত্ম-অবহেলার খেলা নিত্যই যায় ঘুচে।
ছেঁড়া পটের টুকরো জমে পথের প্রান্ত জুড়ে,
তপ্ত দিনের ক্লান্ত হাওয়ায় কোন্‌খানে যায় উড়ে।
'গেল গেল' ব'লে যারা ফুক্‌রে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক-পরে কান্না-সমেত তারাই পিছে ছোটে।—
ঢং ঢং বেজে ওঠে ঘণ্টা,
এসে পড়ে বিদায়ের ক্ষণটা।
মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে,
নিমিষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে॥

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল, হয় না কভু হারা।
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার ইস্‌টেশনে একা।—
এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়

আসে কারা এক দিক হতে ওই,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ওই ॥

শান্তিনিকেতন
৭ জুলাই ১৯৩৮

মধুময় পৃথিবীর ধূলি

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
ব'লে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।'

শান্তিনিকেতন
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-কর্তৃক অনুমোদিত

নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা অতিরিক্ত পাঠ্যগ্রন্থ।

মূল্য ১·৫০ টাকা